আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

গ্রীষ্মকালীন সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯

নতুন আদলে নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে ‘বাংলা স্ট্রিট’-এর বন্ধুদের খুশি আমাদেরও আনন্দিত করেছে। প্রতিশ্রুতিমতো পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা পাঠক বন্ধুদের হাতে তুলে দেওয়া গেল। আশা করা যাক, এই সংখ্যাও পাঠকদের আনন্দিত করতে পারবে।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

বাংলাস্ট্রিট অনলাইন–এর নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা হাতে পেয়ে বন্ধুরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন দেখে আমরাও আনন্দিত।

সকলের ভালোবাসার দাবি মেনে বাঙালি হিসেবে আমরা আগেও যেমন আন্তর্জাতিক আলোয় নিজেদের মনকে আলোকিত করতে চেয়েছি এখনো তার ব্যত্যয় হয়নি দেখে সবাই খুশি। সবাই চেয়েছেন বাংলা স্ট্রিট অন লাইন যেন সব ক্ষেত্রে সমসময়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে। আমরাও আমাদের গন্তব্যকে সেই তারেই বেঁধে নিতে চেষ্টা করেছি। এই লক্ষ্যেই যুক্ত হয়েছে কিছু নতুন কলাম। এসেছেন নতুন লেখকেরা। তাঁদের নানা জনের নানা মতকে আমরা চেয়েছি একসূত্রে গাঁথতে , যাতে আমরা নিজেদের পাশাপাশি পাঠককেও ভাবাতে পারি। সস্তা বিতর্কে তাই আমাদের অনীহা। বাংলাস্ট্রিট আগের মতোই পাঠকের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে চায়, নিজেদের মনের দিগন্তকে আরো আলোয় মেলে ধরতে চায়।

চলার পথে সুধী পাঠকের পরামর্শ আমাদের কাম্য। এই অদ্ভুত খারাপ সময়ে দাড়িয়েও আপনাদের নিজস্ব মনন, তথা মানসিকতার সঙ্গী হতে চাই আমরা। বাংলা স্ট্রিট অনলাইনের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের প্রাক্কালে আপাতত এটুকুই হোক আমাদের পথ চলার পাথেয়।

সূচিপত্র

বিগ পিকচার – ইউক্রেন Page 4
বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

আবার বছর কুড়ি পর Page 9
প্রসেনজিৎ মজুমদার

আজকের কলকাতা কি তাহলে মুছে ফেলতে চায় বিদ্রোহী কবির সামান্য স্মৃতিটুকুও ? Page 13
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

এটা আমার তরফ থেকে তোমার অ্যাওয়ার্ড Page 21
চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

বাঙালি জাতিকে দাবায়ে রাখা যায় না, বুঝেছিলেন বঙ্গবন্ধু Page 25
তরুণ চক্রবর্তী

যেতে যেতে নদীর সঙ্গে দেখা Page 30
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

কবির সান্নিধ্যে Page 32
প্রণব দত্ত

ভুল নীতিতে লাগাতার দাম বৃদ্ধি, শোধরাবে কবে সরকার ? Page 35
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

বাংলায় শিল্প উদ্যোগ : একটি জরুরি আলোচনা সভা Page 39
নিজস্ব প্রতিবেদন

লেখা ১

বিগ পিকচার - ইউক্রেন

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

পৃথিবীর একটা কোণে যুদ্ধ চলছে। তাই নিয়ে সারা পৃথিবীর এত মাথা ব্যথা কেন? শুধু ইউরোপ বলে? রাশিয়ার আগ্রাসন, সেজন্য? এর আগেও তো পৃথিবীর কত কোণায় কত যুদ্ধ হয়েছে, কই তখন তো এত মাথাব্যথা ছিল না? রাশিয়া যখন জর্জিয়ার ওপর আক্রমণ করল তখনও তো কই এত চেঁচামেচি হয়নি, যখন ক্রিমিয়া দখল করল, তখনও না। তাহলে এখন কেন?

পুটিনের ইউক্রেন আক্রমণের কারণ পুটিন যা বলেছেন – (১) ইউক্রেনের বর্ডারে ন্যাটো থানা গেড়ে বসে আছে, যেটা রাশিয়ার পক্ষে শঙ্কাজনক, (২)ইউক্রেন ক্রমশই ন্যাটো এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকছে, যেটা রাশিয়ার পক্ষে ক্ষতিকারক, (৩) ইউক্রনের নাৎসী সরকারের উচ্ছেদ (এটা হাস্যকর), (৪) ইউক্রেনকে 'ডিমিলিটারাইজ ' করা, এবং (৫) 'ডনবাস' অঞ্চলের লোকেরা ইউক্রেনের 'বর্বর' সরকারের থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাদের স্বাধীনতা দেওয়া। এর মধ্যে প্রথম দুটো যদি স্বীকার করাও যায়, পরের দুটো কোনোমতেই নয়। কাল যদি চীন বলে যে অরুণাচল প্রদেশের লোকেরা স্বাধীনতা চায়, আর সেটা দেওয়া চীনের কর্তব্য, আমাদের কীরকম লাগবে?

সে যাক, আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে যে, কারণগুলো খুব একটা ‘সলিড’ তো নয়ই, ২০২২-ই যে এগুলো করার প্রশস্ত সময়, তারও কোনো পরিষ্কার যুক্তি নেই।

তাহলে কেন ? জানতে হলে আমাদের ‘ফীল্ড অফ্ ফোকাস’ একটু বড়ো করতে হবে। প্রচ্ছন্ন কারণ যেগুলো, তার মধ্যে রয়েছে, (১) ইউক্রেনের লিথিয়াম ডিপোজিট, (২) বেশ কয়েকটা শিল্পক্ষেত্রে ইউক্রেনের রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দী হয়ে ওঠা, (৩) ‘নিউ সিল্ক রুট’ -এর ওপর ইউক্রেনের ভাগ বসানো ইত্যাদি। দেখা যাক এগুলোর অর্থ কী।

প্রথমত, লিথিয়াম এখন একুশ শতকের পৃথিবীর ‘নতুন সোনা’ । লিথিয়াম ছাড়া লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি চলে না, আর ওই ব্যাটারি ছাড়া পৃথিবীর তাবৎ ইলেক্ট্রিক এবং ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের কোনোটিই চলে না। লিথিয়াম আছে কাদের কাছে ? লিথিয়াম পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় আছে, কিন্তু তাকে ‘প্রফিটেবলি’ বার করা শক্ত। ইউক্রেনে যা আছে তা সহজেই বার করা যায়। চীন এবং রাশিয়াতেও প্রচুর আছে, কিন্তু তাকে বার করা ব্যয়সাপেক্ষ। চীনের থেকে আস্ট্রেলিয়াতে লিথিয়াম কম আছে, কিন্তু আস্ট্রেলিয়ার প্রোডাকশন চীনের থেকে বেশি। সুতরাং ইউক্রেনের লিথিয়াম ডিপোজিটের ওপর নজর তো পড়বেই। দুই নম্বর, বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে ইউক্রেনের অগ্রগতি লক্ষণীয়। যারা এইসব বড়ো মেশিন আগে রাশিয়া থেকে কিনত তারা ক্রমশই ইউক্রেনের দিকে ঝুঁকছে (এর মধ্যে ভারতও আছে)।

তিন নম্বর ব্যাপারটা প্যাঁচালো। প্রথম চীন-ইউরোপ ফ্রেট করিডর তৈরি হয় রাশিয়া আর বেলারুসের মধ্যে দিয়ে। গত দশ বছরে ইউক্রেন পশ্চিমা দেশগুলোর অপারেটরদের কাছে ক্রমশ প্রিয় হয়ে উঠেছে। বেলারুস যে প্রায় রাশিয়ার একটা প্রদেশ সেটা সকলেরই জানা। কাজেই, পুরো রাস্তাটার ওপর রাশিয়ার কন্ট্রোল ছিল। এখন ইয়ক্রেন তাতে ভাগ বসাবার চেষ্টায় আছে। এতে রাশিয়ার অস্বস্তি হবারই কথা। একটা কথা ভুললে চলবে না। পৃথিবীতে আজ পযর্ন্ত যত যুদ্ধ হয়েছে, তার বেশির ভাগই বাণিজ্য এবং ট্রেড রুট নিয়ে। সবাই সেটা নিজের কব্জায় রাখতে চায়। এক্ষেত্রে, যদি এই নিউ সিল্ক রুটের বেশ কিছুটা অংশের কন্ট্রোল ইউক্রেনের কাছে চলে যায়, সেটা চিন্তার বিষয় বইকি।

তবে এটাকে চীনের রাশিয়াকে সাপোর্ট করার একটা কারণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। ইউক্রেন চীনের বিশেষ কাছের দেশ নয়,তার ওপর ইউরোপের প্রভাব যথেষ্ট। এখন

চীনের বাণিজ্য যদি ইউক্রেন পরে আটকায়, তাহলে মুশকিল। তবে কাহিনি এখানেই শেষ নয়। আপাতদৃষ্টিতে চীন- রাশিয়া অক্ষ মজবুত মনে হলেও তাতে চিড় ধরেছে সম্প্রতি। এর কারণ চীনের অভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক অবস্থা। বেশ কয়েক মাস ধরেই চীনের বাজার খারাপ যাচ্ছে। চীনের Debt to GDP ratio এখন প্রায় ৩০০%। বাজারে টাকা নেই, বড়ো ব্যাংকরা টাকা ধার দিতে চাইছে না। প্রপার্টি মার্কেট পড়ে গেছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন ১৯৯০ সালে জাপানের যা অবস্থা হয়েছিল, চীনের অবস্থাও সেরকম হতে পারে। যুদ্ধের জন্য চীনের রপ্তানি মার খাচ্ছে। সাধারণত শুধু রেলওয়ে দিয়েই ইউরোপে বছরে ১৮ লক্ষ কন্টেইনার যায় চীন থেকে। রেলওয়ে তে ঝামেলা হবার পর এখন অত মাল চীনের পোর্টে জমা হচ্ছে। এর ওপর আছে কোভিড। তার জন্যেও একে তো মাল তৈরি হচ্ছে না, তারপর তৈরি হলেও, পাঠানো যাচ্ছে না। চীনের 'ক্রেডিবিলিটি' পৃথিবীতে অনেক কমেছে ইদানিং, অনেক দেশই এখন আর চীন থেকে ধার নিতে চাইছে না, 'ডেট্ ট্র্যাপ' -এ কেউ পড়তে চায় না। শ্রীলংকা তো জ্বলন্ত উদাহরণ। এইসব বিভিন্ন কারণে চীন রাশিয়াকে যতটা সাপোর্ট দিতে পারত, ততটা ঠিক দিতে পারছে না।

যেটা ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে সেটা হচ্ছে, পশ্চিমা দেশগুলোর 'রুলস্ বেসড় ওয়ার্ল্ড অর্ডার' , যেটা আসলে 'রুলস আমাদের, অর্ডার তোমাদের জন্য দিলাম' গোছের রাবিশ বলে দেখা হচ্ছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী তো সরাসরি একথা বলেছেন। স্যুইফট রাশিয়া থেকে সরিয়ে নেবার পর চীন একটা প্রস্তাব রেখেছিল যে, চীন, রাশিয়া এবং ভারতকে নিয়ে নতুন ফিনানসিয়াল সিস্টেম তৈরি করা উচিৎ। চীনকে কেউ বিশ্বাস করে না বলে সেটা বেশিদূর গড়ায়নি এখনও পযর্ন্ত। তবে রদবদল যে একটা দরকার, বাকি পৃথিবীকে এই (আমাদের) রুলস্ বেসড় ওয়ার্ল্ড অর্ডারের গল্প বেশিদিন আর খাওয়ানো যাবে না, এটা পশিমা দেশগুলোও এখন বুঝছে।

সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে চীনের সামনে চয়েস এখন বেশ কম। তাইওয়ান নিয়েও এখন বিশেষ কিছু করা যাবে না, কারণ তাতে পৃথিবী বলবে রাশিয়াকে 'রিলিফ' দেবার জন্য চীন এটা করছে। একটা কাজ করা যায়, এবং চীন সেটা করেছেও – নিজেদের প্রক্সি নর্থ কোরিয়াকে চাগিয়ে দেওয়া। নর্থ কোরিয়ার সম্প্রতি নতুন মিসাইল টেস্ট এটাই প্রমাণ করে।

আর এই বিরাট ছবিটার মধ্যে ভারত কোথায় দাঁড়িয়ে? ভারতে অবস্থা এখন অনেকটা ক্রিকেটের ওপেনিং ব্যাটসম্যানের স্টান্স নেবার আগে মাথা ঘুরিয়ে পুরো

ফিল্ডটা দেখে নেবার মতো। বেড়ার ওপর বসে ভারত এখন তা-ই করছে। ব্যাটসম্যান হিসেবে গ্যাপগুলো দেখে নিচ্ছে। এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে, ইদানিং ভারতের কাছ থেকে যত কড়া কথা ইউরোপ এবং আমেরিকা শুনেছে, এতটা আগে কখনো শোনেনি। আগে আমেরিকানদের প্রত্যেকটা কমেন্টের জবাব দিত ভারত, এখন আর তা করে না। ভারতের বিদেশমন্ত্রী তো মুখে মুখে জবাব দেবার জন্য প্রায় বিখ্যাত হয়ে গেছেন। গ্যাপ তাহলে কোথায় ? আপাতত বড়ো গ্যাপ হল (১) ইন্ডো-প্যাসিফিক, (২) চীনের BRI এর অগ্রগতি আশানুরূপ না হওয়া, (৩) WTO-র প্রস্তাবিত আমূল সংস্কারকে রূপায়ন করা, এবং (৪) আফ্রিকা। সংক্ষেপে বলছি। ইন্ডো-প্যাসিফিকের সিকুরিটির ইস্যু নিয়েই 'কোয়াড' (ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং আমেরিকা); লক্ষ্যণীয় যে, ভারত মহাসাগরের অন্য দিক রক্ষা করার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে আঁতাত করতে চাইছে। ভারতকে কেন্দ্র করে পূর্বদিকে 'কোয়াড' এবং পশ্চিমদিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ভারত। মজার কথা হল, আফ্রিকার কথা কিন্তু কেউ কোথাও বলছে না। অথচ একটা গোটা মহাদেশকে বাদ দিয়ে চললে তো 'ওয়ার্ল্ড অর্ডার' হয় না ! আমি সেজন্য এটাকে চার নম্বর পয়েন্ট বলেছি। এটা অবশ্য তিন নম্বরের সঙ্গেও আসে। ব্রি-এর পুরো গল্পটা এখন পৃথিবী আর খাচ্ছে না। কারণ ওই --- ডেট ট্র্যাপ। এর বিকল্প হিসাবে ভারত খাড়া করেছে INSTC (International North South Trade Corridor) এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বার করছে তাদের কানেক্টিভিটি স্ট্র্যাটেজি। এখানে অংক হল, টাকা তো লাগবেই, সেটা যত কম লাগে তত ভালো, আর যেসব দেশের ওপর দিয়ে এই রুট যাবে তাদের সবাইকে পার্টনার ধরে নিয়ে চলা, যেটা চীনের প্রস্তাবে নেই। WTO-র বলটা অবশ্য ভালোই খেলেছে ভারত। যখন de minimis পাশ হয়েছিল (যাতে বলা হয় যে, কেউ তার দেশের সমগ্র কৃষি উৎপাদনের দশ শতাংশের বেশি রপ্তানি করতে পারবে না ; তখন ভারত আপত্তি করেছিল। আপত্তি টেঁকেনি। বলা হয়েছিল এটা ফুড সিকিয়রিটির ব্যাপার। আরেকটা উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল। অনুন্নত দেশ যদি বেশি রপ্তানি শুরু করে দেয় কম দামে,

তাহলে উন্নত দেশগুলোর চাষিরা মার খাবে, ফসলের দাম পড়ে যাবে। ভারত এখন যা চেয়েছে সেটা হল স্পেশ্যাল পারমিশান, পৃথিবীতে গমের অভাব এ বছর, সুতরাং ভারতকে বেশি রপ্তানি করতে দেওয়া হোক। প্যাঁচটা ভালো। যদি রপ্তানি করতে দেওয়া হয় তাহলে এটা precedent হয়ে রইল। এটাকে thin end of the wedge ও বলা চলে। আর যদি সে পারমিশন না দেওয়া হয় তাহলে পৃথিবীর সামনেই এই সংস্থাটার আর কোনো মর্য্যাদা থাকবে না। যারা লোকেদের খাবারের সংস্থান করতে দেয় না, তারা তো মানুষের শত্রু!

গাভাস্কার আর তেন্ডুলকরের দেশ থেকে অন্তত এইটুকু আশা করা যায় যে এই গ্যাপগুলোতেই সময়মতো বল মারা হবে। আগামী এক বছরের মধ্যেই ছবিটা আরও খোলসা হবে আশা করা যায়।

লেখা ২

আবার বছর কুড়ি পর

প্রসেনজিৎ মজুমদার

কথা হচ্ছিল ক্রীড়াসাংবাদিক গৌতম ঘোষের সঙ্গে। প্রসঙ্গ কাতার বিশ্বকাপ। উনি বললেন,'এইবারের বিশ্বকাপে রাশিয়াকে বার করে দেওয়ার সিদ্ধান্তটা পুরোটাই রাজনৈতিক। ৩২টা দেশ এবারের বিশ্বকাপে খেলবে খুব সম্ভবতএই শেষবার। পরের বিশ্বকাপে ৪৮টা দল খেললেও এটা সে অর্থে ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ' । প্রসঙ্গত ১৯৭৮-এর বিশ্বকাপ ছিল ১৬টি দলের। ৮২র বিশ্বকাপ ছিল২৪ দলের। নব্বই সালের বিশ্বকাপ ছিল ৩২দলের। পরের বছরের বিশ্বকাপ হবে৪৮ দলের। এই বিশ্বকাপ হতে চলেছে মেসি ও রোনাল্ডোর মতো দুই মহাতারকার শেষ বিশ্বকাপ। এবং হ্যাঁ, আবার ২০বছর পরে এশিয়াতে ফিরে এল বিশ্বকাপ। আর ঠিক সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের ৩৬নম্বর দল রাশিয়া বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করেও মাঠের বাইরের কারণেই বিশ্বকাপের আসরে উপস্থিত হতে পারল না। এটা অনেকের মতে দুর্ভাগ্যজনক বটে। প্রসঙ্গত গত বিশ্বকাপের আসর বসেছিল রাশিয়ায়। তখন রাশিয়ার ফিফা রাঙ্কিং ছিল ৭০। বিশ্বকাপের ৩২টা দেশের মধ্যে সবথেকে খারাপ। এমনকি রাশিয়ার ফুটবল ইতিহাসেও সবথেকে খারাপ রাঙ্কিং।

এবারের কাতার বিশ্বকাপে মোট আটটি শহরে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর জন্য সম্পূর্ণ নতুন নটি স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে জানাই কাতারে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল স্টেডিয়ামের সংখ্যা হল ৯৭৪। 'ভাবতে পারেন আমরা কোথায় পিছিয়ে আছি!' বললেন একটি বাংলা দৈনিকের প্রবীণ সাংবাদিক গৌতম

ঘোষ–যিনি একসময়ের বিখ্যাত সংবাদমাধ্যমগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উনি আরও বলেন ‘সাধে কি কাতার এশিয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে?’ প্রসঙ্গত ভারতের রাঙ্কিং যখন ছিল ৯৬ তখন কাতারের ছিল ৯৭। এশিয় চ্যাম্পিয়ন হবার পর কাতার পৌঁছে যায় ৬২তে এবং এই মুহূর্তে ৫২তে দাঁড়িয়ে। যাইহোক, এবারের বিশ্বকাপের ৩২টা দলকে মোট আটটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এবারের বিশ্বকাপেও কোয়ালিফাই করতে পারল না ইতালি , ঠিক গতবারের মতো। গতবারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ না করতে পারলেও তারপর থেকে রেকর্ড সংখ্যক ম্যাচ জিতেও অপরাজিত থেকে ইতালি বিশ্বকাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডে এসেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তীরে এসে তরী ডুবল তাদের। এবারের বিশ্বকাপে যেতে পারল না অস্ট্রেলিয়ার মতো বিশ্বের ১৯ নম্বরে থাকা দেশ। আবার কয়েক বছর আগেও ভারতের মতোই র‍্যাঙ্কিংএ থাকা কানাডা দীর্ঘ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপের আসরে ফিরেএল।

এই বিশ্বকাপে এশিয়ার দলগুলোর দিকে কি দৃষ্টি ফিরবে ফুটবল বিশ্বের? ঠিক যেমন ভাবে ২০বছর আগে জাপান–দঃকোরিয়ার বিশ্বকাপের আসরে এশিয়ার দিকে দৃষ্টি ফিরেছিল ফুটবলবিশ্বের। সাংবাদিক কুণাল দাশগুপ্ত এপ্রসঙ্গে জানালেন ‘সেবারএশিয়ার দলগুলোর পারফরম্যান্সই ফুটবল বিশ্বকে বাধ্য করেছিল এশিয়ার দিকে নজর দিতে। স্বাগতিক জাপান বিশ্বকাপের প্রি–কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিল। এবং আরেক স্বাগতিক দেশ দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বের তাবড় সমালোচকদের চমকে দিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল। ইয়োরোপ আমেরিকার বাইরে এশিয়ার দক্ষিণ কোরিয়াই প্রথম দল যারা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছোয়। ১৯৩০ থেকে শুরু করে এখনও পর্যন্ত এটাই রেকর্ড’ । ১৯৩০ সালে সবাইকে চমকে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল। সেইপ্রথম উত্তর আমেরিকার কোনো দল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছোয়। উত্তর আমেরিকার অন্যতম দল মেক্সিকোর পর্যন্ত এই ট্র্যাক রেকর্ড নেই।

মেক্সিকোর আবার অন্যরকম ট্র্যাক রেকর্ড আছে। সেটা হল ব্রাজিলের মতোই মোটামুটি প্রায় সব বিশ্বকাপেই কমবেশি খেলার অভিজ্ঞতা আছে তাদের। কিন্তু এহেন মেক্সিকো বিশ্বকাপে বহুবার দ্বিতীয় রাউন্ড, প্রি–কোয়ার্টার ফাইনাল,কোয়ার্টার ফাইনালে খেললেও সেমিফাইনাল তাদের কাছে অধরাই থেকে গ্যাছে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে দক্ষিণ কোরিয়ার মতোই বিশ্বফুটবলের আন্ডার ডগ মার্কিনিরাও ২০০২ সালে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ওঠে। সেই বিশ্বকাপ জিতেছিল রোনাল্ডিনহোর ব্রাজিল।একটা অদ্ভূত অর্থগত সমাপতন দেখা যাচ্ছে এবার সেটা হল আবার বিশ্বকাপ ফিরেএসেছে এশিয়ায়

এবং ব্রাজিল এক নম্বর দল হিসেবেই মাঠে নামছে।এই মুহূর্তে ফিফা রাঙ্কিং অনুযায়ী ব্রাজিলইএক নম্বর দল।গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স,রানার্স ক্রোয়েশিয়া বেলজিয়াম ইংল্যান্ডের মতো দল ব্রাজিলের পেছনে। আর গতবারের রানার্স ক্রোয়েশিয়া প্রথম দশেই নেই।আছে ১৬ নম্বরে।

কাতারকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে মে-জুন মাসে হওয়া বিশ্বকাপকে নভেম্বর-ডিসেম্বর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হল? কুণাল এই প্রসঙ্গে জানালেন 'আসল কেলেঙ্কারিটা আসলে এখানেই। এই বিশ্বকাপের বরাত কাতারকে দেওয়ার জন্যই তো ফিফার প্রাক্তন সভাপতি সেপব্লাটার এবং মিশেল প্লাতিনির মতো মহাতারকাকে উৎকোচ নেবার কলঙ্ক নিয়ে সরে যেতে হয়।ভাবা যায় বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে ২১ ডিসেম্বর (সোমবার) এবং শেষ হচ্ছে ১৮ ডিসেম্বর(রবিবার)! দ্বিতীয়ত কাতারে ইয়োরোপ- অ্যামেরিকার মতো যত্রতত্র মদের দোকান নেই। সেইজন্য একসময় ইয়োরোপ-অ্যামেরিকার দলগুলি কাতারে গিয়ে খেলতে চায়নি' । এইঅভিযোগ অবশ্য সবার জানা।এখন মিটেও গিয়েছে এসব সমস্যা। যাইহোক এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে কাতারের আটটি শহরে হবে বিশ্বকাপ। যেসব স্টেডিয়ামের কথা জানা যাচ্ছে তার মধ্যে ৮০ হাজার দর্শক আসন বিশিষ্ট লুসেইল স্টেডিয়াম বা ৬০হাজার দর্শক আসন বিশিষ্ট আলবাইট স্টেডিয়াম উল্লেখযোগ্য। ২০১০সালেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল২০২২সালের বিশ্বকাপ হচ্ছে কাতারেএবং গত দশ বছরের বেশি সময় ধরে বিশ্বকাপের যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরি করেছে কাতার।

কে জিতবে এবারের বিশ্বকাপ? এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। আলাপ হয়েছিল যাদবপুরের বাসিন্দা ব্রাজিলের সমর্থক অনুপম দত্তের সঙ্গে। উনি বললেন 'হৃদয়ের কথা যদি বলেন তাহলে বলব ব্রাজিল। কিন্তু যুক্তি বলছে আর্জেন্টিনা,ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানির মধ্যে যে কেউ জিততেপারে' । তবে সুয়ারেজের উরুগুয়েবাসি আর সেভেনের পর্তুগাল নিয়ে তেমন আশাবাদী হতে দেখা গেল না ভদ্রলোককে। উনি আরও বলেন ' তবে ডার্কহর্স হিসেবে অনেক দল অঘটন ঘটাতে পারে। যেমন কে ভেবেছিলেন গতবার ২০নম্বর রাঙ্কিংএর

দল ক্রোয়েশিয়া ফাইনালে উঠবে? তেমনই এবার কে জানে আফ্রিকার সিংহ সেনেগাল,উত্তরঅ্যামেরিকার মেক্সিকো কিংবা এশিয়ার জাপান,দক্ষিণকোরিয়া বা সৌদি আরব অঘটন ঘটাবে কিনা ? ১৯৯৪ বিশ্বকাপে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছিল সৌদিআরব। তবে কেউই প্রায় গুরুত্ব দিচ্ছে না উদ্যোক্তা কাতারকে। ভুলে যাবেন না কাতারের এক অদ্ভুত রেকর্ড আছে বই কি! সেটা হল খারাপ দলের সঙ্গে খারাপ খেলা এবং ভালো দলের সঙ্গে ভালো খেলা। যে কাতার বাংলাদেশের সঙ্গে হারে এবং ভারতের সঙ্গে নিজের মাঠে ম্যাচ ড্র করে সেই দলই ব্রাজিল,আর্জেন্টিনাকে হারায়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ যেই জিতুক বডড়োদিনের আগে বিশ্বকাপ জয়ের উৎসবপালন দেখবে ফুটবল বিশ্ব এই প্রথম।এটাও একধরনের নতুন অভিজ্ঞতা হবে বইকি!বিশ্ব ফুটবলের মহাকুম্ভে যোগ্যতা অর্জন করেও যেতে না পারার যন্ত্রণা রাশিয়ার মানুষ কিভাবে নেন সেটাও দেখার বিষয়।সেইজন্যই বলা যায় ‘ কুড়ি কুড়ি বছর পার' দিয়ে আবার এশিয়ায় ফিরে আসা বিশ্বকাপ সর্বঅর্থেই ঐতিহাসিক।

লেখা ৩

আজকের কলকাতা কি তাহলে মুছে ফেলতে চায় বিদ্রোহী কবির সামান্য স্মৃতিটুকুও ?

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

চলতি বছরের ২৪ মে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ১২৩ তম জন্মদিন। সার্ধশতবর্ষ প্রায় দোরগোড়ায়। তাই খতিয়ে দেখতেই হয়, নজরুলের কাজকর্ম সংরক্ষণ, তাঁকে নিয়ে চর্চার প্রয়াস কতটুকু? এই কলকাতা শহরেই অনেকগুলি বাড়িতে বসবাস করেছিলেন তিনি। এইসব বাড়ির প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই কবির জীবনের একেকটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়ের স্মৃতি জড়িয়ে। অথচ আশ্চর্য হতে হয়, এইসব বাড়িকে ঘিরে কোনোরকম সংরক্ষণের সরকারি প্রচেষ্টা অতীতে কখনো সেভাবে দেখা যায় তো নি-ই, এমনকি আজও দেখা যায় না। বরং অবহেলার ছাপই চোখে পড়ে বেশি। আমরা তেমনই কয়েকটি বাড়ির বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করব। ঠিকানাগুলির দরজায় কড়া নেড়ে দেখার চেষ্টা করব বাংলার কবি নজরুল ইসলামের স্মৃতি-স্পন্দন আদৌ এখনও সেখানে ধ্বনিত হয় কিনা!

৭১ কৈলাস বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬।

বর্তমানে বাড়িটির জীর্ণ ভগ্নদশা সত্ত্বেও উখরার জমিদারদের এই বাড়ির ফটকে পা রাখলেই ইতিহাস কথা বলতে শুরু করে। ১৯১৭ সালে কলকাতায় এসে নজরুল ইসলাম সর্বপ্রথম এই বাড়িটিতেই উঠেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন সাহিত্যিক শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। উখরার জমিদারদের এই

বাড়িটি ছিল বিখ্যাত। শৈলজারঞ্জনের মামারবাড়ির সঙ্গে উখরার জমিদারদের চেনাজানার সূত্রেই রানিগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের দশম শ্রেণির দুই ছাত্র এই বাড়িতে এসে ওঠেন। এখান থেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন ভবিষ্যতের 'বিদ্রোহী' কবি। আমরা দেখতে চেয়েছিলাম কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিধন্য এই বাড়িটির এখনকার পরিস্থিতি। না, আশাপ্রদ কিছুই চোখে পড়ল না,বরং যে অভিজ্ঞতা হল তা সম্পূর্ণ উল্টো। এই অভিজ্ঞতা আমরা নিবন্ধটির শেষে উল্লেখ করব। এখন চট করে চলে যাই চলুন এস. এন ব্যানার্জি রোড সংলগ্ন তালতলা লেনে।

৩/৪ সি তালতলা লেন , কলকাতা-৭০০০১৪ ।

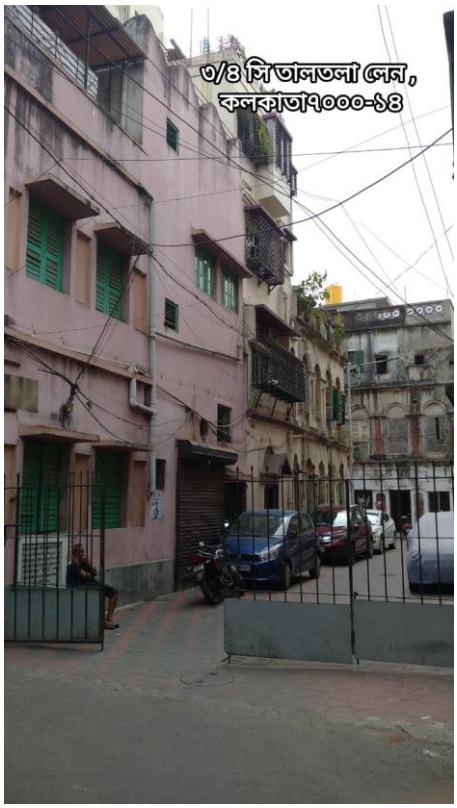

যুদ্ধের টাটকা স্মৃতির উত্তাপ মেখে তখন ফিরে এসেছেন কবি। সেই স্মৃতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে নিজেকে প্রকাশের পথ খুঁজছিল। ১৯২১ সালের আগস্টের কথা। এই বাড়িটিতেই মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন তিনি। মাত্রই মাস ছয়েক এই বাড়িতে থেকেছিলেন নজরুল, তবে এই সামান্য সময়টুকু তাঁর জীবন তথা বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও মহা মূল্যবান । সেই সময়ের

সঙ্গেই ওতপ্রোত জড়িয়ে এই বাড়িটির স্মৃতি। এখানেই একদিন ভোরবেলায় হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লিখেছিলেন। মুজফফর আহমেদের লেখায় আমরা পাই, ‘কবিতাটি পেন্সিল দিয়ে লিখেছিল। দোয়াতে বারবার কলম ডোবাতে গিয়ে মাথার সাথে হাত তাল রাখতে পারবে না। এই ভেবেই সম্ভবত কবিতাটি সে পেন্সিল দিয়ে লিখেছিল।’ কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে এক মাইলস্টোন, যা দিয়ে কবিকে চিহ্নিত করা হয়। এই বাড়িতে তিনি 'ভাঙার গান' ও আরো অনেক কবিতাই রচনা করেছিলেন। মোহিতলাল মজুমদার থেকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, এই বাড়িতে সকলেরই পায়ের ছাপ পড়েছিল। আর আজ, বাড়ির গেটের কাছে একটি ফলকই পড়ে রয়েছে শুধু ! বাড়ির যে অংশে নজরুল থাকতেন, সেটি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। সেখানে ছোট্ট ফ্ল্যাটে এখন অন্য লোকের বসবাস। ফলক লাগানো অংশটিও বিক্রি হয়ে যেতেই পারে। তখন কি এই অমূল্য স্মৃতিফলকটুকুও আর থাকবে? সংশয় আছে।

নজরুলের পরের ঠিকানা হিসেবে আমরা চলে যাচ্ছি এন্টালি সংলগ্ন হাজী লেনে। ৬ হাজী লেন, কলকাতা-৭০০০১।এন্টালি মার্কেটের পাশের রাস্তা ধরে মিনিট দশেক হাঁটলে একটি গলি। সেখানেই মিলবে এই ঠিকানা। কিন্তু সেখানে কি মেলে কবি নজরুল ইসলামের স্মৃতির কোনো চিহ্ন ! না, যথারীতি পাইনি। তবে সেই বাড়ি এখনো আছে।এমনকি সেই ঘরও। কেবল সেখানে এখন বাস করছেন মহম্মদ মেহবুব আলম। ১৯৮৫ সালে তিনি এই বাড়িটিতে এসে উঠেছিলেন। প্রশ্ন করেছি, নজরুলকে আপনি চিনতেন ? দরজা হাট করে খুলে দিলেন মেহবুব, যেন হৃদয়ের প্রশস্ত দরজাই খুলে দিয়ে ভাঙা বাংলায় বললেন, ‘হ্যাঁ, কেন চিনব না! তিনি কবি ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। এই তো এই ঘরেই থাকতেন উনি। এখানেই উনার বিয়ে হয়...’ আজ্ঞে হ্যাঁ, মেহবুব আলম সাহেব যথার্থই বলছেন। হাজী লেনের এই বাড়িটির সঙ্গে কবির জীবনের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জড়িয়ে। এই বাড়িতেই বিদ্রোহী কবি 'একইবৃন্তে দুটি কুসুম' নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে প্রমীলা দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। হোসায়ন সাহেব, ফজলুল হক, চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন সে বিয়ের সাক্ষী। উল্টোদিকে প্রবল খেপে গিয়েছিলেন নজরুলের হিন্দু-মুসলিম আত্মীয় বন্ধুরা। এমনকি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ব্রাহ্মদলের প্রকাশ্য বিরোধিতা তো হয়েছিলই, তা ছাড়া শনিবারের চিঠি-র সঙ্গে যুক্ত অনেকেই এই বিয়ের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। এই বিয়ের কারণে 'প্রবাসী' পত্রিকায় নজরুলের লেখা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এতবড়ো একটি সময়ের দলিল, অথচ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিসেবে আমাদের লজ্জা ও কুণ্ঠার বিষয় -- এই বাড়ির অন্তত একটি ঘর সংরক্ষণ তো দূরে থাক, একটা স্মৃতিফলক পর্যন্ত নেই ! সময় আমাদের বিদ্রূপ করছে। সেই বিদ্রূপ গায়ে মেখেই চলুন পরের গন্তব্যে যাই।

১১, ওয়েলেসলি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৩।

কৃষ্ণনগরে বেশ কিছুকাল কাটানোর পর ১৯২৮ সালে নজরুল ইসলাম আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। তথ্যসূত্র জানাচ্ছে শারীরিক চিকিৎসার কারণেই নজরুলের এই ফিরে আসা। ফিরে এসে এই বাড়িতেই অবশ্য প্রথমে ওঠেননি। উঠেছিলেন বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের বাড়িতে । ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে কাজী মোহতার হোসেনকে লেখা নজরুলের চিঠি থেকে পাওয়া যাচ্ছে, 'আমার কলকাতার ঠিকানা --১৫ জেলিয়াটোলা স্ট্রিট। ওখানে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার (Musician) থাকেন। যাঁকে 'বাঁধনহারা' dadicate করেছি।' তারপর কিছু অসুবিধা হওয়ায় সেই বাড়ি ছেড়ে সস্ত্রীক চলে আসেন এই ১১, ওয়েলেসলি স্ট্রিটে। বর্তমানে এই রাস্তার নাম রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড। এই বাড়িতে 'সওগাত' পত্রিকার অফিসও ছিল, যেখানে তিনি নিয়মিত লিখতেন। এই বাড়িতেই কবির স্ত্রী প্রমীলা দেবী সন্তানসম্ভবা হন। রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডে ১১ নম্বর বাড়িটি খুঁজতে খুঁজতে মৌলানা আজাদ কলেজ ছাড়িয়ে যেতে হল। ম্যাজেস্টিক সিনেমা হলের ঠিক আগেই উঁকি দিল বহুকালের

পুরনো জরাজীর্ণ বাড়িটা। বাড়ির নিচে পাঁচমিশেলি দোকানপাট। মূল দরজার পাশে একটি প্লাইউডের দোকান। দেয়ালে ঠেসানো একটি প্লাইবোর্ড সরিয়ে ধূলোমলিন স্মৃতিফলকটি আবিস্কার করতে হল। যেখানে সওগাত পত্রিকার অফিস এবং নজরুল ইসলামের বসবাসের উল্লেখটুকু রয়েছে। বাজি ধরে বলা যায়, সন্ধানী ব্যক্তি খুঁজে বের করার প্রাণপণ চেষ্টা না করলে এই ফলক চেনবার উপায়টুকুও নেই। অথচ এই বাড়িটিও হেরিটেজ বিল্ডিং হতে পারত। কেন হয়নি? এই প্রশ্ন উহ্য রেখে আমরা পরের ঠিকানায় যাই, যেখানে গীতিকার-সুরকার নজরুল তথা বাংলা গানের এক অনন্য ঘরানার উন্মেষ ঘটেছিল।

৮/১ পানবাগান লেন, কলকাতা-৭০০০১৪।

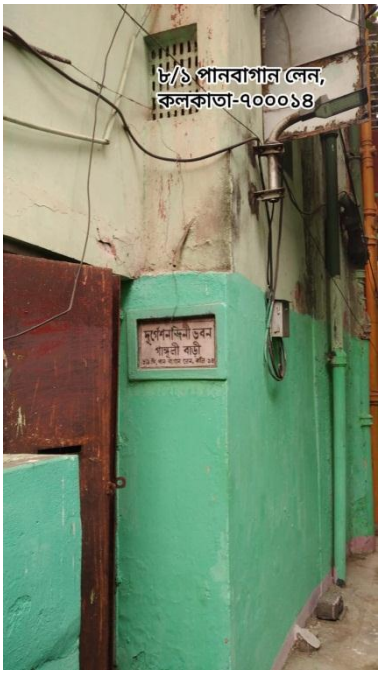

এই বাড়িতেই কাজি সব্যসাচীর জন্ম। এই বাড়িতেই নজরুলের সংগীত চর্চার সূচনা। প্রমীলা দেবী যখন সন্তানসম্ভবা , তাঁর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে নজরুলকে ওয়েলেসলি স্ট্রিট (রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড) ছাড়তে হয়। তখন 'ধুমকেতু' পত্রিকার ম্যানেজার শান্তিপদ সিংহ বাস করতেন এই বাড়ির দোতলায়। তিনি নজরুলের সাহায্যার্থে বাড়ির দোতলাটা তাঁদের বসবাসের জন্য ছেড়ে নিজেরা একতলায় নেমে আসেন। বাড়িটি গাঙ্গুলিবাড়ি বলে পরিচিত হলেও ভেতরে ঢুকলে নাম পাওয়া যায় 'দুর্গেশনন্দিনী ভবন'। নজরুল ও প্রমীলাদেবীর কাছে এই দুর্গেশনন্দিনী দেবী মায়ের মতো ছিলেন । নজরুলের জীবনী সূত্রে এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। পানবাগান লেনের এই বাড়ি নজরুলের জীবনের আরেকটি মাইলস্টোনও বটে। বিদ্রোহী কবি, সাহিত্যিক নজরুল ইসলামের মধ্যে থেকে ২০ টি নতুন রাগের স্রষ্টা, বাংলা গজলের প্রথম স্রষ্টা নজরুলের উন্মেষ ঘটেছিল এই বাড়িতেই। উস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব এখানে নিয়মিত এসে নজরুলকে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম দিতেন। এখানে থাকাকালীনই যোগাযোগ ঘটে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে। সেই ঠিকানা আজ কোথায়! বর্তমানে বাড়িটি ৮/১ এ, বি, সি অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত। আশেপাশের অন্য অন্য বাড়ির মতো এই বাড়িটিও পাঁচবাড়ির ভিড়ে নিজের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। তবে বর্তমান গৃহকর্তাদের একজন জানালেন নজরুলের পরিবারের লোকজন

মাঝে মধ্যে যোগাযোগ রাখেন। তবে সরকারি তরফে কোনো রকম স্মৃতিরক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমনকি নজরুলের নামে একটি ফলক পর্যন্ত এখানে গোয়েন্দা লাগালেও পাওয়া যাবে না।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। যতগুলি বাড়িতে খোঁজখবর করতে যাওয়া হয়েছে, তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ির বর্তমান বাসিন্দা অথবা স্থানীয় লোক প্রশ্ন করেছেন, 'আপনি কি বাংলাদেশ থেকে আসছেন?' এই প্রশ্ন থেকেই বাংলাদেশের নজরুল চর্চা এবং উল্টোদিকে পশ্চিমবঙ্গের অবহেলা যেন আরো বেশি স্পষ্ট হয়। বাংলা কবিতায় ভিন্ন মাপের উন্মাদনার সঞ্চার যিনি ঘটালেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করলেন, সক্রিয় অংশ নিয়ে জেল খাটলেন, বাংলা গানে রাগ নিয়ে অতুলনীয় গবেষণার সাক্ষ্য রাখলেন সেই নজরুল তো অবিভক্ত বাংলার সম্পদ! জীবনের ১৬টি বছর স্মৃতিহারা নির্বাক হয়ে থাকলেও ঢাকা চলে যাওয়ার আগে তিনি বারবার পিছন ফিরে চেয়েছিলেন। সেই অধ্যায়েরই কিছুকাল আগের কথা। ১৯৪২ সাল। তখনও মানসিক স্বাস্থ্যে অসংলগ্নতা পুরোপুরি দেখা দেয়নি। তখনও বেশ কিছুটা সক্রিয় ছিলেন কবি নজরুল। এই সময়েরই ঠিকানা --- ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৫ ।

এই শহর যেমন কবি নজরুলকে সাদরে গ্রহণ ও ধারণ করেছিল, তেমনই উল্টোদিকে প্রত্যাখ্যানের স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে। তেমনই এক ঠিকানা এই ১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রিট। এই বাড়ি কবিকে নির্মম প্রত্যাখ্যানের ঐতিহাসিক কলঙ্ক মোছার সুযোগ আর কোনোদিনই পাবে না। আর তাই নজরুলের জীবন থেকেও তাকে মুছে ফেলা যাবে না। পুরোপুরি নির্বাক হওয়ার আগে মাঝেমধ্যেই কবি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়তেন। সেইসময়ে মুজফফর আহমেদ নজরুলের জন্য একটি চাকরির বন্দোবস্ত করলেও,

১৫/৪ শ্যামবাজার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০৫

চাকরি করার মতো অবস্থায় কবি ছিলেন না। ১৯৪৬- এর দাঙ্গাবিধ্বস্ত সময়ে কলকাতার চেনা মানচিত্র বদলাচ্ছিল। এই ঠিকানা থেকেই উধাও হয়ে গিয়েছিলেন কবিপত্নী প্রমীলা দেবীর মা। দাঙ্গার কারণে বাড়ির পাশে নির্মিত নজরুলের নামাঙ্কিত ফলকটিও সরিয়ে দেওয়া হয়, এবং বাড়িওয়ালা শ্যামলাল সরকার কবি নজরুল ইসলামকে কার্যত জোর খাটিয়ে মামলা করেই সপরিবারে উচ্ছেদ করেন।

বর্তমানে এই বাড়িটিতে এক ঘর মাড়োয়াড়ির বসবাস। স্থানীয় লোকেরা জানাচ্ছেন-- এই বাড়ির মালিক ছিলেন একজন প্রফেসর, যাঁর আশ্রিত অতিথি হিসেবে এসে উঠেছিলেন নজরুল। দাঙ্গাবিধ্বস্ত সময়ে আত্মগোপন করেছিলেন কি ! সেই সংশয়ও তাঁরা প্রকাশ করছেন। পরে নজরুল চলে যান। আমরা জানতে পারছি তাঁকে উচ্ছেদ করা হয়। এরপর বাড়িটি কবে বিক্রি হয়েছে কারুর জানা নেই। পাশেরই এক মাড়োয়াড়ি খরিদ্দার বাড়িটি কিনে নিয়েছেন। এখন সেই মাড়োয়াড়ি পরিবারই সেখানে বসবাস করেন। এসব জেনে কি মনে হয়না, বাড়িগুলির স্মৃতিরক্ষার প্রয়াস না দেখিয়ে কার্যত ইতিহাসকেই মুছে ফেলার চেষ্টা চলেছে ? এবার শেষ বাসস্থান, যেখান থেকে নির্বাক নজরুল বিদায় নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চিরতরে দূরে চলে যাবেন। রেখে যাবেন এপিটাফ 'আমারে দেব না ভুলিতে!'

ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা -১৪ (সিআইটি বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট 'এল' - ৪) এন্টালি পদ্মপুকুরের কাছে এই বাড়িটি নজরুল ইসলামের কলকাতার শেষ ঠিকানা। তখন কবি সম্পূর্ণ বাক্যহারা। মায়ের মৃত্যুর পর কবির বড়ো ছেলে কাজী সব্যসাচী ছোটো ভাইয়ের পাইকপাড়ার বাসস্থান থেকে বাবাকে এই ফ্ল্যাটে এনে রেখেছিলেন। সময়টা ৬০ দশকের মাঝামাঝি । টানা ১১ বছর এখানে কাটিয়েছেন কবি। তখন প্রতি মাসের প্রথম শনিবার 'নজরুল অ্যাকাডেমি' এখানে নজরুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠানের আয়োজন করত। যদিও কবি শারীরিকভাবে সেখানে থাকলেও, মানসিকভাবে তাঁর ভাব ব্যক্ত করতে পারতেন না। তবু উপস্থিতি তো ছিল ! ১৯৭২ সালে কবি বাংলাদেশে চলে যাওয়ার পর, অনুষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায়। চামড়া হাটের পিছনের রাস্তায় মিনিট দশেক হাঁটলে ব্রিজের দুপাশে সি.আই.টি প্লটে নির্মিত কোয়ার্টার। বাঁদিকের একেবারে

শেষ প্রান্তে 'এল' ব্লকের কাছে গেলে মনে হয়, এখানে এসেই সমস্ত পথ থমকে থেমে গিয়েছে। এখানেও নজরুল ইসলামের নামে কোনো ফলক নেই। যদিও কাজী নজরুল ইসলামের পারিবারিক প্রতিনিধিরাই এখানে বাস করেন। সাধারণত বাইরেই থাকেন। বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় এলে এই ফ্ল্যাটেই ওঠেন তাঁরা। বললেন জনৈক স্থানীয় অধিবাসী।

পরিশেষে আসি সেই বাড়িটির কথায়, যেখান থেকে নজরুলের কলকাতাজীবন ও এই নিবন্ধের যাত্রা শুরু, এবং যে অভিজ্ঞতাটি সবশেষে উল্লেখ করার কথা ছিল। রামমোহন লাইব্রেরির উল্টোদিকে সুকিয়া স্ট্রিটের দিক থেকে মিনিট পাঁচেক এগোলেই কলকাতায় নজরুলের প্রথম বাসস্থান ৭১, কৈলাস বোস স্ট্রিট। সেখানে খোঁজ করতে গিয়ে শোচনীয় অভিজ্ঞতা। উখরার জমিদার বাড়িটির এসময়ের এক বয়োজ্যেষ্ঠ অভিজাত বাসিন্দা গাড়িতে ওঠার আগে স্পষ্টতই হাত নেড়ে অস্বীকার করে দিলেন-- 'না না, ওসব বাজে কথা। নজরুল-টজরুল কেউ এখানে থাকতেন না'(!!!)

আক্ষেপের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে, সময় আর হাতে নেই, আঙুলের ফাঁক দিয়ে সুযোগও অনেকখানিই বেরিয়ে গিয়েছে। তবু এখনও আন্তরিক ও সরকারি প্রচেষ্টায় নজরুলের স্মৃতি সম্বলিত এই বাড়িগুলি রক্ষা করা কি যায় না , কোনো একটিকেও কি 'হেরিটেজ' স্বীকৃতি দেওয়া যায় না, কলকাতায় বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সমস্ত স্মৃতিই কি এভাবে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে ? একদিন যে কেউ হাত নেড়ে এভাবেই হয়তো বলে দেবে , 'নজরুল কোনোদিন কলকাতায় থাকতে আসেননি!'

আশা করা যাক, অতটা শোচনীয় পরিণতির আগেই সম্মিলিত উদ্যোগে নজরুলের স্মৃতিধন্য বাড়িগুলি সংরক্ষণ করতে সরকারের তরফে হয়ত কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে। দেখা যাক, এই সম্মিলিত সাংস্কৃতিক কালঘুম আদৌ ভাঙে কিনা !

কৃতজ্ঞতা : কলকাতায় নজরুল : ডা শঙ্কর কুমার নাথ ও তারক নাথ ঘোষ

লেখা ৪

এটা আমার তরফ থেকে তোমার অ্যাওয়ার্ড

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

মুম্বাই-এর বান্দ্রায় চোপড়া হাউস। মুভি মোগল বি আর চোপড়ার বাড়ি। অন্ধেও দেখিয়ে দেবে। অ্যাপয়মেন্টটা করে দিয়েছিলেন শচীন ভৌমিক। মুম্বাই সিনেমা জগতে শচীন ভৌমিকের তখন দারুণ প্রতাপ। কলকাতাতেই শচীনদার সঙ্গে আলাপ। 'প্রসাদ' পত্রিকার অফিসে। পত্রিকা সম্পাদক ক্ষীতিশ রায়ের সৌজন্যে। তখন আজকাল প্রকাশন থেকে 'টেলিভিশন' মাসিক পত্রিকা প্রকাশের তোড়জোড় চলছে। তখনও বাংলায় এত টেলিভিশন চ্যানেল ছিল না। কলকাতা দুরদর্শনই প্রায় একমাত্র। ফলে 'টেলিভিশন' নিয়ে কাগজ চালাতে হলে মুম্বাই-ই ভরসা। সেই কাজেই মুম্বাই আসা। মুম্বাই-এর বান্দ্রায় 'গাজিব' -এর ঠিক পেছনে ফাস্ট রোডে 'আজকাল' -এর দারুণ গেস্ট হাউস। ফ্ল্যাট-টা ছিল বাংলার গায়ক শ্যামল মিত্রের। তাঁর কাছ থেকেই কেনে 'আজকাল' । বিয়ের আগে অমিতাভ জয়া এই 'গাজিব' রেস্টুরেন্টে-ই প্রেম করতেন। গেস্টহাউসের সামনের রাস্তা ধরে সামনের দিকে উঠে গেলে নানক পার্কের সামনে মিঠুন চক্রবর্তীর ফ্ল্যাট। ডুপ্লেক্স। মুম্বাই সেলেবদের সঙ্গে যোগাযগের ব্যাপারে বন্ধু মিঠুন যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সে কথায় পরে আসা যাবে। পল্লবী যোশি তখন সবে টি ভি-তে এসেছেন। সিনেমায় অভিনয় এর অনেক পরে। আন্ধেরি-তে এক কামরার ফ্লাটে বাবা মা ভাইদের সঙ্গে

থাকেন। সবে ছোটো পর্দায় অভিনয় শুরু করেছেন। বড়ো পর্দা তখন বেশ দূরে।অদম্য উৎসাহ নিয়ে নানা কথা বললেন। ট্রাম চোখে দেখেননি কোনোদিন। ছবিতে দেখেছেন। কলকাতায় এসে ট্রামে চড়ার স্বপ্ন তাঁর। সেই স্বপ্ন অবশ্য পূরণ হয়েছিল তাঁর। পরে 'আজকাল' টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ড-এ এসেছিলেন পল্লভী। বাংলায় সেই প্রথম টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ড। বিশাল করে হয়েছিল। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম কানায় কানায় ভর্তি। স্টেডিয়ামে চাঁদের হাট। নাসির, শাবানা, গুলজার, অনুপম খের, বি আর চোপড়া, রমেশ সিপ্পি প্রমুখ তো সব তখন টেলিভিশনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। সবাই ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। মুম্বাই-দিল্লির টি ভি দুনিয়া সেদিন উঠে এসেছিল স্টেডিয়ামে। এ সব তো অনেক পরে। তখন তো 'টেলিভিশন' মাসিক পত্রিকা হিসেবে সুপারহিট। কলকাতায় আমাদের বেস-ক্যাম্প হয়েছিল তাজ হোটেলে। মুম্বাই থেকে আসা সকলকে তোলা হয়েছিল এই অভিজাত হোটেলেই। আমার আর ভাস্কর মিত্রের ওপর অতিথি অ্যপায়নের ভার। খুব সহজ কাজ নয়। তারকাদের বায়না সামলানো। যেমন নাসির তো গাঁজা খুঁজছে। নিজেই ব্যবস্থা করে নেবে বলল। আবদার একটাই, ওর সঙ্গে একবার রাসবিহারীর মোড়ে যেতে হবে। গাড়ি নিয়ে যেতেই নিজেই জায়গাটা চিনে ফেলল নাসিরুদ্দিন। একটু দূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দূটো বাড়ির মাঝখানের এক সরু গলিতে ঢুকে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরে এসে গাড়িতে উঠল। হাতে একটা ছোটো প্যাকেট দেখিয়ে বলল 'পেয়ে গেছি' । মুম্বাইয়ের নাসির কলকাতায় গাঁজার ঠেক চিনল কী করে? জানাল, এটা আমায় চিনিয়েছে গৌতম। তখন ওর ছবি করার জন্যে এই শহরে ছিলাম বেশ কিছু দিন। এবার পল্লভীর বায়না ট্রামে চড়বে। খিদিরপুর ধর্মতলা রুটে তখন ট্রাম চলত গঙ্গার পাড় ধরে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে। একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে রেসকোর্স, ভিক্টোরিয়া, ময়দান। মুগ্ধ হয়ে দেখছিল পল্লভী। যে ট্রামে যাওয়া ধর্মতলা ডিপো হয়ে সেই ট্রামেই ফেরা।

চোপড়ার বাড়ি যাওয়া বা আমার মুম্বাই স্টারট্রেক তো 'টেলিভিশন' -এর প্রস্তুতিপর্ব। রামানন্দ সাগরের 'রামায়ণ' তখন দূরদর্শনে সুপার ডুপার হিট। আমাদের অ্যাওয়ার্ড অনুষ্টানে সীতা মানে দীপিকাও এসেছিলেন। পাশে রাম---অরুণ গোভিল। রাম-সীতা মঞ্চে উঠলে ফেটে পড়েছিল স্টেডিয়াম। আমাদের আলোকচিত্রী অশোক চন্দ রাম-সীতাকে ফটোশ্যুট করতে বেরোল শহর কলকাতায়। দীপিকার আবদারে আমাকেও সঙ্গে যেতে হল। টপস আর আল্ট্রা জিনস পরা সীতা মা। আর প্যান্টের ওপর টি শার্ট পরা রামচন্দ্র। প্রথমে অনেক মানুষেই বুঝে উঠতে পারেননি। ধরা পড়ল প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে গিয়ে। প্রথমে চিনে ফেলল এক মাঝি। 'সীতা মাঈয়া' বলে সাস্টাঙ্গে দীপিকাকে

প্রণাম করে ফেলল সে। রাম সীতাকে ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছে পাবলিক। অতিকষ্টে পুলিশের সাহায্য নিয়ে সে যাত্রায় রেহাই পাওয়া গেল।

আগেই বলেছি এসব অনেক পরের কথা। 'টেলিভিশন' জন্মাবার পর তো টেলিভিশন অ্যাওয়ার্ড। টেলিভিশন প্রস্তুতিপর্বের সময় আমার প্রথম বি আর চোপড়ার সঙ্গে প্রথম মোলাকাত। চোপড়া হাউসে তো পৌঁছোনো গেল। নাম বলতেই বিশাল এক বসার ঘরে নিয়ে গেলেন চোপড়ার সচিব। মিনিট খানেকের মধ্যে মুভি মোগল এলেন। এসেই জিজ্ঞেস করলেন, কী খাবেন? কফি না কোল্ড ড্রিঙ্কস। যাই হোক এসব পর্ব মিটলে সাক্ষাৎকারপর্ব শুরু করতে চাইলাম। উনি বললেন, রাস্তার ওপারেই আমার অফিস। ওখানে যান।আমি যাচ্ছি। সচিবকে নির্দেশ দিলেন আমাকে অফিসে নিয়ে যেতে। মধ্যিখানে রাস্তা। পেরিয়েই অফিস ঘরে ঢুকলাম। অবাক কাণ্ড। বাস্তব না ম্যাজিক ! দেখি সেখানে বসে আছেন চোপড়া সাহেব। এলেন কী করে ? আমি তো আগেই রাস্তা পেরিয়ে এখানে এসেছি।এখানে আসতে হলে তো আমাকে টপকে আসতে হয়। নিশ্চিত ভাবে আমার চোখে পড়ত। আমার মনের কথা যেন পড়তে পারলেন বি আর চোপরা। বললেন, আসলে ওই যে রাস্তা দেখলেন, ওর তলা দিয়ে একটা রাস্তা আছে। যেটা আমাদের নিজস্ব। আমরাই তৈরি করেছি। বাড়ি থেকে অফিস। সারা মুম্বাই শহরে প্রাইভেট আন্ডারপাস এই একটাই।

সাক্ষাৎকারপর্ব শুরু হল। তাঁর বৈচিত্র্যময় চলচ্চিত্রজীবন নিয়ে নানা প্রশ্ন। একের পর এক। যা 'আজকাল' –এ বেরোয়। কথা শেষ করে যখন প্রায় উঠব উঠব করছি তখন হঠাৎ চোপড়া সাহেব প্রশ্ন করলেন, আপনি রুপা গাঙ্গুলিকে চেনেন ? সত্যি বলতে কী রুপার সঙ্গে তখন বেশ ভালোই আলাপ। মুম্বাইতে এসেও দেখা হয়েছে। কেননা তখন ও মুম্বাইতে। দু চারটে হিন্দি ছবি করছে। বললাম, ভালোই চিনি। কেন জিজ্ঞেস করছেন ? না, রুপাকে আমার একটা সিরিয়ালে নিতে চাইছি। আপনি সিরিয়াল করছেন ? আমি বসে পড়েছি। হাঁ।মেগা সিরিয়াল ৯৪ পর্বে।দূরদর্শনে। বি

আর চোপড়া টি ভি তে? কাঁপাকাঁপা গলায় প্রশ্ন করলাম, কী সিরিয়াল। উত্তরে একেবারে চমকে উঠলাম । চোপড়া জানালেন, মহাভারত। গুছিয়ে বসে পড়লাম সোফায়। ডিটেলসে জানতে চাইলাম। চোপড়া সাহেব বললেন, আর কিছু বলব না। আপনিই প্রথম সাংবাদিক যে এই গোপন খবরটা জানলেন। প্লিজ লিখবেন না। লিখব না এটা হতে পারে ? চোপড়া সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা হেড পোস্টাপিস। তখনও কম্পিউটার আসেনি। মেল হোয়াটস অ্যাপ মেসেজ স্বপ্নের বাইরে। রোমান-এ লিখে পোস্টাপিসের টেলিপ্রিন্টারে সেটা পাঠাতে হত। কাগজ থেকে উত্তর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা। যাই হোক, সেদিনই এই অল ইন্ডিয়া স্কুপ কলকাতার কাগজে গেল। পরদিন ফ্রন্ট-পেজ। বাই-লাইন। পরে 'টেলিভিশন' প্রথম সংখ্যায় কভার স্টোরি। রামায়ণের পর মহাভারত। ততদিনে অনেক ডিটেলস হাতে। সত্যবতী হচ্ছেন দেবশ্রী রায়। দ্রৌপদী হবার কথা ছিল জুহি চাহলার। কিন্তু তিনি তখন 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক ' নিয়ে ব্যস্ত। তাই রুপাই দ্রৌপদী। আরও অনেক ডিটেলস বেরিয়ে ছিল 'টেলিভিশন' -এ।

অনেক পরে চোপড়ার আমন্ত্রণেই 'মহাভারত' -এর শুটিং স্পটে গেছি। তখন তো কম্পিউটার গ্রাফিকস নেই।ফলে সবই স্পেশাল এফেক্টের কারসাজি। হাতের কারিগরি। যেমন সুতোয় তীর বেঁধে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। আর ছোটো পর্দায় মনে হত যেন তীর ছুটছে। এই রকম আরও অনেক। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ --- একদিকে বড়ো লাটাই-এ দীর্ঘ লম্বা এক শাড়ি জড়িয়ে রাখা হয়েছে। যতই শাড়ি টানছে দুর্যোধন ততই শাড়ি সাপ্লাই দিচ্ছে লাটাই। পরে এডিটিং টেবিলে কৃষ্ণকে জুড়ে দেওয়া হয়। চোপড়ার মহাভারত-কে ঘিরে অসংখ্য স্মৃতি।

আজকাল অ্যাওয়ার্ডে বি আর চোপড়াও এসেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে তাজ বেঙ্গল-এ হঠাৎ আমাদের অস্থায়ী অফিস ঘরে চোপড়া সাহেব হাজির। হাতে বিশাল দু হাঁড়ি কে সি দাশের রসগোল্লা। সেটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এটা আমার তরফ থেকে তোমার অ্যাওয়ার্ড।

লেখা ৫

বাঙালি জাতিকে দাবায়ে রাখা যায় না, বুঝেছিলেন বঙ্গবন্ধু

তরুণ চক্রবর্তী

বাঙালি জাতিকে সত্যিই দাবিয়ে রাখা যায় না। এটা ঠিকই বুঝেছিলেন বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই মানব সভ্যতার ইতিহাসে জঘন্যতম গণহত্যার পরও বাঙালি আজও মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আজ গোটা দুনিয়ার কাছে বিস্ময়ের। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার যে দেশটিকে তলাহীন ঝুড়ির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, সেই বাংলাদেশ আজ বিভিন্ন সামাজিক সূচকে প্রতিবেশী ভারতকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমস্ত ষরযন্ত্রকে প্রতিহত করে বাংলাদেশের এই উন্নয়ন বিস্ময়কর।

সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের মতে, কোনও ম্যাজিক দন্ডের সাহায্যে বাংলাদেশের এই উন্নতি হয়নি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়ার পর তাঁরা ঠিক করেচিলেন মানুষের রোজগার বাজড়াতে হবে। সেই লক্ষ্যেই তাঁরা কাজ করে গিয়েছেন। সাফল্য এসেছে। আজ গ্রাম বাংলার দিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়। বাংলাদেশের গড় আয়ু এখন দাঁড়িয়েছে নারীর গড় আয়ু ৭৪ বছর ৬ মাস আর পুরুষের ৭১ বছর ২ মাস ১২ দিন। মাথাপিছু রোজগার ২৫৯১ ডলার। জিডিপি ৬.৯ শতাংশ। ৭৫.৬ শতাংশ সাক্ষরতার হার। নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানেও বাংলাদেশ বেশ

এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু দেশটিকে নিকেষ করার চেষ্টা কম হয়নি। একাত্তরে গণহত্যার পর পচাত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে অর্জিত স্বাধীনতা লুন্ঠনের নতুন করে চেষ্টা শুরু করেছিলেন দেশীয় রাজাকাররা। বারবার আঘাত হানার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেই আঘাতকে প্রতিহত করে বাঙালিই তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ আর সচেতন লড়াকু মনোভাব দিয়ে আগলে রেখেছে লাল-সবুজ পতাকা। পাকিস্তান, আমেরিকা বা চীন কেউ দাবিয়ে রাখতে পারেনি বাংলাদেশকে। এগিয়ে চলেছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙালি। অথচ, একাত্তরের গণহত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকেই ধংস করার ষরযন্ত্র করেছিল পাকিস্তান। সেই ষরযন্ত্রে তাদের মদদ জুগিয়েছিল আমেরিকা ও চীন। একাত্তরে মতো বর্বরোচিত ও নৃশংস ঘটনা খুব কম ঘটেছে। অথচ গণহত্যার ৫০ বছর পরও সেই ঘটনার জন্য ক্ষমা না চেয়ে পাকিস্তান চালিয়ে যাচ্ছে ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা। পাকিস্তান, চীন বা যুক্তরাষ্ট্র বাঙালি জাতিকে ধংস করার সেই জঘন্য চেষ্টাকে আজও খাটো করে দেখাতে ব্যস্ত। পাকিস্তানি সেনার নৃশংস হত্যাযজ্ঞ অবশ্যই গণহত্যা। কিন্তু পাকিস্তান ব্যস্ত গণহত্যার ইতিহাস বিকৃতিতে। পাকিস্তানি গবেষক ও লেখকরা এখন নতুন নতুন গল্প বানিয়ে সেই গণহত্যাকে আড়াল করার চেষ্টা শুরু করেছেন। ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা, ৩ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত লুন্ঠনের পিছনেও যুক্তি খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে পাকিস্তান। তথ্য গোপান বা বিকৃতির মাধ্যমে ইতিহাসকে ভুল পথে চালিত করতে সহায়তা করে চলেছে চীন। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন গত ৩১ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছে, একাত্তরের হত্যাযজ্ঞ অবশ্যই গণহত্যা বা জেনোসাইড।

২৫ মার্চের ভয়ঙ্কর সেই রাত বাঙালি জাতি কিছুতেই ভুলতে পারেনা। বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী, শিল্পী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ, কাউকেই রেয়াত করেনি খান সেনারা। অপারেশন সার্চ লাইটের নামে গোটা বাঙালি জাতিকেই শেষ করে দিতে চেয়েছিল তারা। সেই গণহত্যায় নেতৃত্বদানকারী এক সেনাকর্তা তো বলেইছিলেন, ‘আমরা যাকে খুশি হত্যা করতে পারি। সবাইকে হত্যা করবো। যা খুশি তাই করবো। আমরা কারও কাছে দায়বদ্ধ নই।’ খান সেনাদের সেই বর্বরতার কথা বারবার অস্বীকার করে চলেছে পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবীরাও। তারা কিছুতেই সত্য প্রকাশ করতে চাননা। দু-একজন ব্যতিক্রমী গবেষক বর্বরতার কথা উল্লেখ করতে চাইলেও পাকিস্তান সরকার এবং তাদের ধামাধরা গবেষকরা চিরকাল ব্যস্ত থেকেছে সত্যকে ধামাচাপা দিতে। পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর সন্ত্রাস নিয়ে মুখ খোলার অধিকারও নেই কারও। কারণ সেনাই সে দেশের শেষ কথা বলে এসেছে চিরকাল।

২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে শুরু হয় গণহত্যা। ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি সেনার হাতে ধর্ষিতা হন তিন লক্ষেরও বেশি বাঙালি নারী। জাতিসংঘের গণহত্যা বা জেনোসাইড বিষয়ক ঘোষণা অনুযায়ী একাত্তরের হত্যাযজ্ঞ অবশ্যই গণহত্যা। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন গণহত্যা খুবই কম হয়েছে। খান সেনাদের বর্বরতায় বাংলাদেশের মাটি রক্তাক্ত হলেও আজও ক্ষমা চায়নি পাকিস্তান। তাদের দুই বন্ধু রাষ্ট্র চীন ও যুক্তরাষ্ট্রও পাকিস্তানি গণহত্যা নিয়ে আজও মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে। এতে করে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাদের অশ্রদ্ধাই প্রকাশ পাচ্ছে।

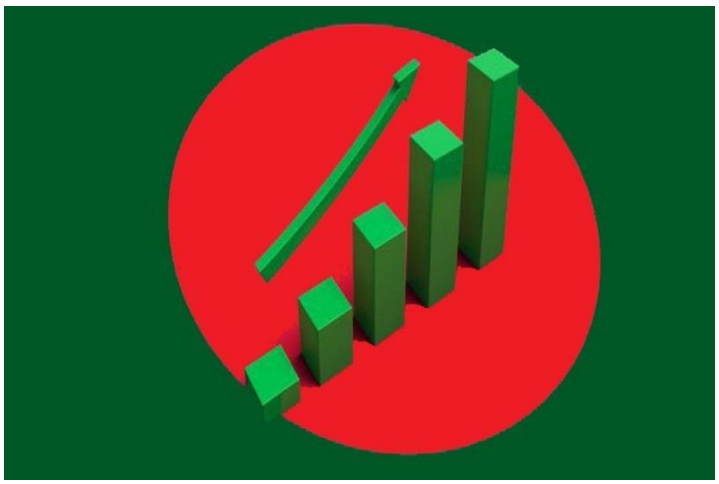

তবে এসব করে বাংলাদেশের উন্নয়নকে দাবিয়ে রাখা যায়নি। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে ধাবিত অর্থনীতি। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের জাতীয় আয় বেড়েছে ৫০ গুন। মাথা পিছু গড় আয় ভারত ও পাকিস্তানকে টেক্কা দিয়ে ২৫ গুন বেড়ে গিয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৫ গুন বাড়লেও মাথাপিছু খাদ্য প্রাপ্যতায় স্থিতিশীল। ১৯৯০ সালের ৬০ শতাংশ দারিদ্রতা এখন কমে এসেছে ২০ শতাংশে। রপ্তানি বাণিজ্য বেড়েছে ১০০ গুন। সমস্ত সামাজিক সূচকেই প্রতিবেশীদের মধ্যে শ্রীলঙ্কাকে বাদ দিলে বাংলাদেশই এগিয়ে রয়েছে। মানবোন্নয়নের সূচক বেড়েছে ৬০ শতাংশ।

রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম দু-দশক ছিল উন্নয়ন বিমুখ। গত তিন দশকেই বাংলাদেশে উন্নয়ন গতি পেয়েছে। ২০১১ থেকে ২০১৯ বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৭ থেকে ৮ শতাংশ। পাকিস্তানের প্রায় দ্বিগুন ছিল কোভিডের আগে দেশের জিডিপি। পাকিস্তান ও ভারতের মতো উন্নত প্রতিবেশীকে টেক্কা দিয়ে বাংলাদেশের সামাজিক সূচকে এগিয়ে চলার পথ কিন্তু মোটেই সহজ ছিলো না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি বারবার দেশটির উন্নয়নের গতিকে শ্লথ করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশ গড়ার সময়ই স্বাধীনতার স্থপতি, জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশকে অস্থির পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। ১৯৯১ সালে হুসেইন মহম্মদ এরশাদ সংসদীয়

গণতন্ত্র ফিরিয়ে না আনার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত সামরিক শাসনে ছিল বাংলাদেশ। এমনকী, ২০০৭ সালেও তদারকি সরকারের আড়ালে চলেছে সেনা শাসন। এতোকিছু প্রতিহত করে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবেই আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় স্বীকৃতি লাভ করেছে। উন্নয়নকেই মূলধন করে পরপর তিনবার নির্বাচনে জয়ী হয়েছে আওয়ামি লিগ। বাংলাদেশের উন্নয়নের পিছনে বিশেজ্ঞরা মনে করছেন, বাংলাদেশের জনগণ সাংস্কৃতিকভাবে সমজাতীয়। ভারত বা পাকিস্তানের মতো এখানে কোনও ভাষাগত, ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক, উপজাতি এবং সামন্ত বিভাজন নেই। গ্রাম ও শহরের বিভাজনও ব্যাপক উন্নয়নের হাত ধরে অসন্তুষ্ঠির সূচককে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। দেশবাসীর আরও ভালো করার তাগিদ গতি বাড়িয়েছে সার্বিক উন্নয়নের। প্রাদেশিক সরকারের বদলে একটিই সরকার থাকায় গোটা দেশের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, সাংবিধানিক এবং আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই রয়েছে। ফলে জনস্বার্থের নীতিগত সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বহু-স্তরীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং মতবিরোধের শিকার হতে হয়না বাংলাদেশকে। দুর্বল বিরোধী দলের বিপরীতে শাসক দলের বলীষ্ঠ নেতৃত্বও বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আশীর্বাদ স্বরুপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা, নারী শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, ক্ষুদ্রঋণ প্রভৃতিকে হাতিয়ার করে এনজিও গুলিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান সরকারও জনকল্যাণে বিভিন্ন এনজিও এবং সুশীলসমাজকে সবরকম সহায়তা করে গতি বাড়িয়েছে সামাজিক উন্নয়ন এবং গণসচেতনতার। বাংলাদেশ লিঙ্গ বৈষম্যের হার নেই বললেই চলে। প্রাইমারি স্কুলে ১০৫ শতাংশ শিশুভর্তির হার। নারীশিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নেও বড় ভূমিকা নিচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতা থাকলেও বেশকিছুদিন ধরে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই। সরকারি পরিকল্পা থেকে শুরু করে তৃণমূলস্তর পর্যন্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কৌশল রয়েছে অপরিবর্তিত। বিনিয়োগকারীরাও তাই পাচ্ছেন নিশ্চয়তা। তারাও উতসাহিত হচ্ছেন বিনিয়োগে। বাংলাদেশ বাণিজ্য উদারীকরণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক দুয়ার খুলে দিয়েছে বহিঃবিশ্বের জন্য। রপ্তানিকারকদের নানাধরনের সুবিধাপ্রদানের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদেরও আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। রেডিমেড গার্মেন্ট রপ্তানিতে এখন চীনের পরই উঠে এসেছে বাংলাদেশের স্থান। নারীর ক্ষমতায়ণের পাশাপাশি তরুণদেরকেও শিল্পস্থাপনায় আগ্রহী করতে তুলতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ। পরিশেষে, দেশের অভ্যন্তরীন সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩০ শতাংশ হওয়াতে উন্নয়নের উর্ধগতিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সক্ষম হচ্ছে বাংলাদেশ। ব্যক্তিগত পুঁজিও প্রচুর বিনিয়োগের ফলে বাড়ছে আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি। রেমিট্যান্স থেকেও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানি বানিজ্য বৃদ্ধির হাত ধরে অর্থনীতিরও ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে। সবমিলিয়ে

বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন যোগ্য নেতৃত্বের হাত ধরে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ভিত্তি প্রশস্ত করেছে। অতীতের অন্ধকার দিলগুলি ভুলে বাংলাদেশে বর্তমানে উন্নয়নের যুগ চলছে। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সবক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নয়ন দেশটিকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তানের অর্থনীতি দিনদিন বিপর্যস্ত হলেও হেনরি কিসিঞ্জারকে ভুল প্রমাণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রের নতুন নজির সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ। তবে মৌলবাদী বা নব্য রাজাকারেরা এখনও অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু কড়া হাতে যাবতীয় অশান্তির মোকাবিলা করে দেশকে স্থিতিশীল উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে হাসিনার নেতৃত্ব।

যেতে যেতে নদীর সঙ্গে দেখা

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

মন তো মথুরাও চলে যেতে পারে। কিন্তু শরীরও যদি কখনো কখনো সঙ্গ না দেয় তবে তো অবধারিত অবসাদ। এমন একটা উস্কানিমূলক ভাবনা থেকেই, কুর্চি ওর গাড়ি বের করল। আমি বানিয়ে নিলাম পরোটা আর আলুডিমছেঁচকি, বৌঠান নিল মিষ্টি। তারপর দুই মা আর দুই মেয়ে মিলে চালাও পানসি, মনচাষা। নামটা শুনলেই কেমন রামপ্রসাদী গুনগুন করে ওঠে গলায়,তাই না? মানবজমিন নয়,স্থাবর জায়গাজমিতেই ইকো ফ্রেন্ডলি ট্যুরিজম আবাদ করে ফলিয়েছেন এঁরা। এই মনচাষা ব্রেনচাইল্ড যাঁদের।

গাড়ি চলল। ভেতরেই মোবাইল ভোজন। চা-পানের ব্যবস্থা নিইনি অবশ্য। যেতে যেতে নন্দকুমার পার হয়ে একটা গোলাপি চূড়ার মন্দির ভেসে উঠবে,তার পাশ দিয়েই গন্তব্য আমাদের। সমুদ্রের খুব কাছাকাছি। তবু সমুদ্র নয়। মিথ্যে বলব না,মন খুঁতখুঁত করছিল একটু।ডানদিকে ঘুরে যাবার মুহূর্তে মনে হচ্ছিল আরেকটু সোজা এগোলেই তো সারিসারি মন্দারমণি তাজপুর শংকরপুর দীঘা...। তখনও জানতাম না, কী অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য ! জিপিএস একটু পাগলামো করলেও আমরা একসময় মনচাষার চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়লাম। গাড়ি পার্ক করে নামব নামব ভাব সকলের, সুন্দর একটা ঠেলাগাড়ি করে আমাদের মালপত্র নিয়ে গেলেন এক মহিলা। প্রচুর

গাছপালা ফুলফল পার হয়ে আমরা মূল চত্বরে পৌঁছোলাম। রিসেপশনে ঢুকে চোখ জুড়িয়ে গেল। কুটিরশিল্পের নিদর্শন যত্রতত্র ছড়ানো। মাদল ঝুলছে নানারকম শিল্প দেয়ালে টাঙ্গানো। আর এককোনে একটা ফাঁকা ক্যানভাস।রংপেন্সিল রাখা আছে নীচে। যার ইচ্ছে, কল্পনা বুনে রঙিন করে তুলবে।

দোলনা ঝুলছে একটা ওয়াটারবডির পাশে। ছোট্ট একটা পদ্মপুকুর।প্রত্যেকটা কটেজ ধানের গোলার আদলে তৈরি। বাঁশ দিয়ে বানানো। ওপরে খড়-ছাওয়া। কিছুই সিনথেটিক নয় কিন্তু। অবাক হওয়ার তখনো কিছু বাকি রয়ে গেছে। পেছনের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়ালেই,একটা ছিপছিপে নদি বয়ে যাচ্ছে।এই পুঁচকে নদিতে আবার জোয়ার ভাটাও খেলছে দেখতে পাব আমরা। মনচাষা রিসর্টের সম্পদ হল এই নদি!

খাওয়াদাওয়ার কথা বলতে ভুলি যদি, তবে অপরাধবোধ জাগবে। ঝকঝকে কাঁসার থালায় ভাত।থালা ঘিরে নানাবিধ ব্যঞ্জনের বাটি সাজানো আছে।সবই এদের ফসল।মাছ থেকে শুরু করে ঘি অবধি।মুরগি ছিল। দিশি মুরগি।স্বাদই আলাদা! আত্মার আরাম আর একঘর আনন্দ নিয়ে দুদিনের ভ্রমণ সেরে মহানগরীতে ফিরে এসেছিলাম আমরা।

লেখা ৭

কবির সান্নিধ্যে

প্রণব দত্ত

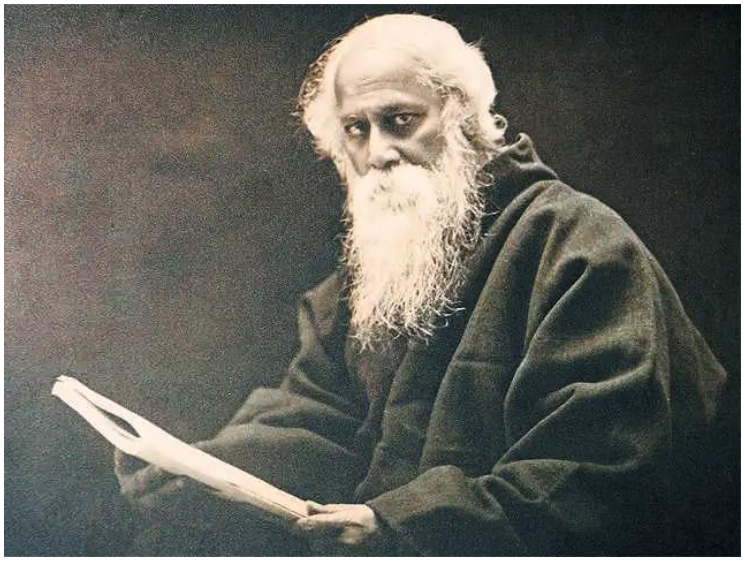

‘বহুদূরে এক-আধটা জাহাজ দেখা যাচ্ছে। চলবার মধ্যে কেবল জাহাজ চলেছে এবং তার দুই পাশের অতি নীল জল নাড়া পেয়ে . অলস আপত্তির কলস্বরে পাশ কাটিয়ে কোনো মতে একটুখানি মাত্র সরে যাচ্ছে।’

হঠাৎ রাতের অন্ধ অমানিশা ভেদ করে এক উজ্জ্বল আলোক রশ্মি জাহাজের ডেকে এসে যেন স্তব্ধ হয়ে আর এক আলোকজ্জ্বল রশ্মিকে আলিঙ্গন করে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করছিল। সারা অঞ্চল একটা স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা আমাকে রোমাঞ্চিত করছিল। এ আমি কি অবলোকন করছি ! আমার সমনে আরামকেদারায় উপবেশন করে আছেন এক জ্যোতির্ময়। দীর্ঘদেহী, শ্মশ্রুযুক্ত সুন্দর আলখাল্লা পরিহিত এক তারকা। মনে পড়ে গেল ঐ জ্যোতিষ্কের মুখনিঃসৃত সঙ্গীরলহরী ‘আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও...।’ কবিগুরুর আকুতিতে প্রকৃতি যেন তাঁকে আলোকের ঝর্ণাধারায় স্নাত করিয়ে এই ভাবে উপস্থিত করেছেন। আমার দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিক্ষেপণ করে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন আমায় আমার উদ্দেশ্য। আমি কবিগুরুকে প্রশ্ন করবার অবকাশ পর্যন্ত পাবার অবস্থায় নেই। শুধু তাঁর মুখখানে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো গত্যান্তর খুঁজে পাইনি। সর্পরাজ যেমন মানুষকে আবিষ্ট করে তেমনি আমি যেন তাঁর দিকে চেয়ে আবিষ্ট হয়ে বসে আছি।

কবিগুরুর কথায় আবেশ থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে বলি, ‘ আপনি আমাকে আপনার পদতলে বসার যে সুযোগ দিয়েছেন তা হারাতে চাই না।’ মৃদু হাস্যে কবিগুরু আমাকে স্নেহভরে বললেন, ‘না, তোমরা সংবাদ জগতের মানুষ , তোমাদের তো জিজ্ঞাস্য থাকারই কথা। তুমি অক্লেশে তোমার কথা বলতে পারো।’

অভয় পেয়ে কবিগুরুকে শুধাই, ‘গুরুদেব আজকের সমাজনীতি সম্বন্ধে যদি কিছু বলেন।’ ‘দেখো, সমাজনীতি সম্বন্ধে বেশি উৎসাহের সঙ্গে কিছু বলা ভালো নয়। আমাদের দেশে বাসরঘরে এবং যে কোনো বিশেষ উপলক্ষে মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে, অন্য কোনো সভায় তেমন করলে সাধারণের কাছে দুষ্য হত সন্দেহ নাই। সমাজে যেমন নিরাময় বাঁধাবাঁধি তেমনি মাঝে মাঝে দু-একটা ছুটিও থাকে –’

‘তবে কি গুরুদেব আমাদের বর্তমান সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আমরা কেউ দায়ী নই?’

‘দায়ী তো বটেই। ঐক্যবদ্ধতাই যে কোনো জাতির রক্ষা কবচ। আমরা বহুকাল যাবৎ পরাধীন, উৎপীড়িত জাতি। বহুকাল যাবৎ কোনো মহৎ সংকল্প সাধন, কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়নি। যার ধর্ম যার সমাজ সজীব সতেজ বিশুদ্ধ উন্নত, ত্রিভুবন তার কাউকেও ভয় করবার নেই। বারুদ এবং সীসকের গোলক দ্বারা তার চিন্তাভাবনা অপহৃত হতে পারে না। আমার মনে হয় আজ ধর্ম বিকৃত হয়েছে, বুদ্ধি পরাস্ত হয়েছে তাই হয়ত রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা হয়েছে। সব অবমাননা সকল দুর্বলতার মূল সমাজের মধ্যে, ধর্মের মধ্যে।’

‘গুরুদেব এই দুর্গতির কি কোনো সুরাহা নেই?’

‘নিশ্চিতভাবে আছে। রাজা রামমোহন রায়ের পদানুসরণ করে ধর্মের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করাই একমাত্র বিকল্প। যদিও এর প্রতিস্থাপন করা অত সহজ নয়। সত্য মিথ্যা বিচার করে গ্রহণ করতে হবে। সতর্ক যুক্তির সাহায্যে সমাজের সমস্ত অকল্যাণকে দূর করতে হবে। বল প্রয়োগের সাহায্যে ধূম নিরস্ত হয় না। অগ্নিকে সম্পূর্ণ প্রজ্জ্বলিত করে তুললে ধূমরাশি আপনি অন্তর্হিত হয়।’

‘গুরুদেব সত্য মিথ্যার দোলাচলে আমাদের সমাজ কি তার গতিপথকে ধীর করে দেবে না?’

‘যে সমাজে সত্য মিথ্যার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই সেই সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। এমনকি জড়ভাবে অন্ধভাবে সত্যকে গ্রহণ করলেও সেই সত্যের কোনো গৌরব থাকে না। সীতার মতো সত্যকেও বারবার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করতে হয়।’

গুরুদেবের মুখনিসৃত বাক্যাবলী অনুধাবন করার জন্য চোখ বন্ধ করে যখন আবার চোখ খুললাম আমার সামনে ক সৌম্যদর্শন কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, কবিগুরুর পুষ্পশোভিত চিত্র যেন অনুচ্চারিত স্বরে বলে উঠছে,

‘শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃত্যস্য পুত্রা আ..... ধামানি দিব্যানি তস্থূ
বেদাহমেং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্নং ...পরাস্তাৎ।।

লেখা ৮

ভুল নীতিতে লাগাতার দাম বৃদ্ধি, শোধরাবে কবে সরকার ?

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

সরকার যে মরিয়া হয়ে গেছে বোঝাই যাচ্ছে। গ্যাসের দাম হাজার টাকা করেও নিশ্চয়তা খুঁজে পাচ্ছে না। সব কিছুর দামই ঊর্ধ্বমুখী। এরপরেও আরও দাম বাড়াতে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার উপর জি এস টি বাড়াতে চাইছে। কিন্তু কেন? কারণ, সরকারের নিজের কোষাগারের অবস্থা খুব খারাপ। বাজেটের প্রস্তাবিত ঘাটতি পেরিয়ে অনেক বাড়বে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আশঙ্কা তাই। তাই আরো দাম বাড়ানোর নীতি নিয়েছে সরকার নিজেই। ক্রমাগত দাম বাড়িয়ে সরকার দু-ভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইছে । প্রথমত জিএসটি বাড়িয়ে রাজস্ব সংগ্রহ বানানোর পদ্ধতি, দ্বিতীয়ত ক্রমাগত দাম বৃদ্ধির ফলে বিলগ্নীকরণের ক্ষেত্রে বেশি দামে সরকারি সম্পত্তি বিক্রির সুবিধা। সরকারের কাছে এটাও একটা টার্গেট। শেষে বাজারটা বিদেশি পুঁজির হাতে খুলে দেওয়ার জন্য লাগাতার তেল ও রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে যাওয়া, যাতে বেচার সময় ভ্যালুয়েশন বাড়িয়ে বেশি দামে সরকারি সমস্ত ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের শেয়ার বেচে বেশি আয় করা যায়।

প্রশ্ন ওঠে, কী এমন দায় ছিল যে এরকম অত্যন্ত লাভজনক সংস্থাগুলো বিক্রি করাটা জরুরী হয়ে পড়ছে ? যোগান কমলে অর্থনীতির নিয়মে দাম বাড়ে। এই দেশে কিন্তু সেই নিয়মে মোটেই জিনিসের দাম বাড়ছে না। এখানে সরকার নিজেই দাম বাড়াচ্ছে। কেন ? কীভাবে ? দেখা যাক।

দামবৃদ্ধির এই চক্র বহুদিন ধরেই চলছে। দিনের-পর-দিন সরকার এমন পরিস্থিতিতে এমন সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আজ না চাইলেও তাতেই পুড়তে হচ্ছে দেশের মানুষকে। শুরু হয়েছে সেই নোটবন্দি থেকে। তারপর অনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে, স্রেফ অবৈজ্ঞানিক ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হল জি এস টি । উদ্দেশ্য সরকারি কোষাগারের আয় বৃদ্ধি। তাই দিনের পর দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আরো বাড়ছে। গত ৫ বছরে মোদী সরকার তেলের দাম বাড়িয়ে ৪০০% বেশি আয় বাড়িয়েছে শুধু কর চাপিয়ে। এক লিটার তেলের উপর প্রায় ২৮ টাকা নেয় কেন্দ্র, আর ২২ টাকা রাজ্য। তাই দাম বেড়ে এখন ১০০!! এর ফলে অন্য সব জিনিসের দামও বাড়ছে । সরকারের যুক্তি, কোষাগারের আয় বাড়লে সেটা নাকি সরকারের খরচ মেটাতে , জনগণকে ভর্তুকি দিতে উপকারে লাগে। অথচ বাস্তব বলছে ঠিক বিপরীত। চলতি বাজেট বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, সরকার ৩৯% ভর্তুকি কমিয়েছে, আর দাম বাড়িয়েছে তেলের উপর প্রায় ১৫%। রান্নার গ্যাস সহ এইসব নানা পণ্যের দাম বৃদ্ধি এই নীতিতে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা অভাবনীয় হয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। কেননা লাগাতার মূল্যবৃদ্ধি আম জনতার মতো সমস্ত কর্পোরেট জগৎকেও যথেষ্ট কোণঠাসা করছে। গোটা অর্থনীতিতে বৃদ্ধির হার যে এরপর আরও কমবে সেটা বলাই বাহুল্য। এবং ঘটনা হল, সবটাই হচ্ছে শুধুমাত্র নীতির ভুলে। অথচ সরকার বলছে, এইটুকু দাম বৃদ্ধি হলে নাকি অর্থনীতির ক্ষতি হয় না। বরং তাতে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ে । সেই থেকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে লগ্নি হবে আর সেই লগ্নি দিয়ে মানুষের আয় বাড়বে, বর্ধিত দামের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আয় বেড়ে সেটাও , তাদের মতে, নাকি উন্নয়নের পথ দেখাবে।

এমন একটা ভাবনা নিয়েই সরকার চলছিল। সেখানেও সে মুখ থুবড়ে পড়ল, কারণ তার কোষাগারের টাকা চলে গেল খেসারত দিতে, কার খেসারত না কর্পোরেটের খেসারত। কর্পোরেট বন্ধুরা একের পর এক লোন নেওয়ার নাম করে ভারতের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ কোটি টাকা। টাকাটা এখনো পর্যন্ত কর্পোরেট সংস্থাগুলি নিয়েছে শুধু নয়, আর কোনোদিনই ফেরত দেবে না বলে রিজার্ভ ব্যাংক প্রায় ঘোষণা অব্দি করে দিয়ে দিয়েছে. ব্যাংক গুলিকে

প্রায় বলে দিয়েছে তোমরা ভুলে যাও, তোমরা ওই টাকা ব্যালেন্স শিট থেকে সরিয়ে দাও। এর অর্থ সাড়ে সাত লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ ভারতবাসীর মুখ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। দেশবাসী নিরন্তর পরিশ্রম করে পায়ের ঘাম মাথায় তুলে যে অর্থ রোজগার করে, কোনো মতে দিন গুজরানের পর জীবনের সংকট মেটাতে যে টাকা তারা ব্যাংকে রাখে সেই টাকা দিয়ে এই কর্পোরেট বন্ধুদের স্বপ্নবিলাসী প্রকল্পগুলিকে ফাইনান্স করতে অনুমোদন করেছিল ভারত সরকার স্বয়ং। এবং তার ফলেই আজ প্রতিটি কর্পোরেটের মুখ থুবড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোপাট হয়ে যাচ্ছে মানুষের কষ্টের সম্পদ সঞ্চয়।

হ্যাঁ, এই সমস্তই এখন মানুষের মুখের গ্রাসের তীব্র দাম বৃদ্ধির পেছনে একটা প্রেক্ষাপট। এগুলোর কথা না বললে দামবৃদ্ধি কেন হচ্ছে তা বোঝানো যায় না। কারণ , দাম বৃদ্ধি একদিনে হঠাৎ হয় না, হয় খানিকটা দীর্ঘমেয়াদি রোগের মতোই অর্থনীতিতে যখন সঞ্চয়ে টান পড়ে দেশে বিদেশি মুদ্রার তুলনায় নিজস্ব মুদ্রার হার কমে যায়। তখন আমদানি বেড়ে যায়, আমদানির খরচ বেড়ে যায় এবং সেই আমদানি করে দেশের মানুষের কাছে পণ্য পৌঁছয় আরো বেশি দামে, কারণ উৎপাদনের খরচ বেড়ে যায়। আর দাম বৃদ্ধি মানেই হচ্ছে উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি ---- এক কথায় যাকে বলে মুদ্রাস্ফীতি।

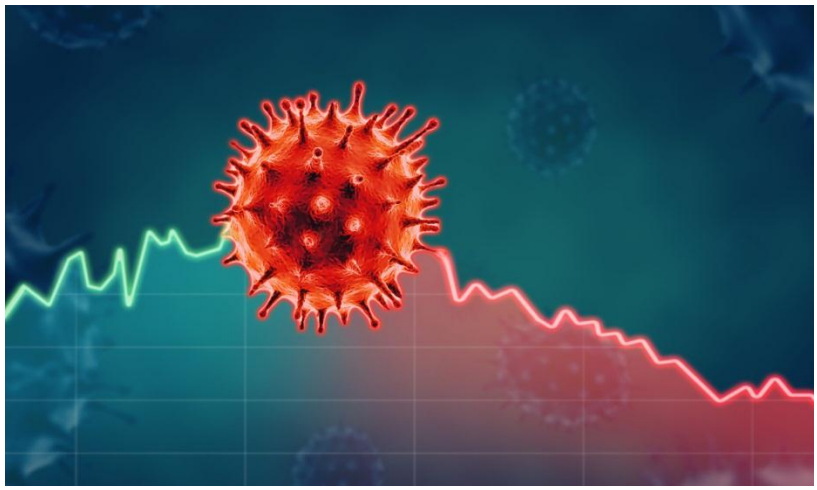

মুদ্রাস্ফীতির দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাচ্ছে যে, গত ১৪মাস ধরে একটানা মুদ্রাস্ফীতি কিন্তু বেড়েইছে। করোনাকালে যখন মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ ছিল, ঘরে বসে সঞ্চয় ভাঙিয়ে খাওয়া ছাড়া কোনো কাজ ছিল না, যখন বাজার ছিল বন্ধ তখনও কোনোমতে মুদ্রাস্ফীতিকে ধরে রাখা গেছিল । কারণ তখন তেলের দাম ছিল জলের চাইতে সস্তা। করোনাকালে এই তেল থেকে অর্জিত সঞ্চয় কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন ছিল পরিকল্পনা করা। করোনাকালের পর অর্থনীতি সচল হলে, ধীরে ধীরে চাহিদা বাড়লে জিনিসপত্রের দাম কিছুটা হলেও বাড়বে এটা ভেবে নিয়ে আগাম

সর্তকতা নিয়েছিল পৃথিবীর প্রায় সব বড়ো উন্নত দেশ। কেবল নেয়নি ভারত, তখনো পর্যন্ত ঋণ দান করে মানুষকে অর্থনীতিতে ঘুরে দাঁড়াবার মন্ত্র যুগিয়েছে মোদি সরকার। ভুল ছিল এইখানেই।

যখন দেশের মানুষের হাতে টাকা নেই, তখন দরকার ছিল নগদ টাকার যোগান। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দেশের সমস্ত প্রথম সারির অর্থনীতিবিদ একই কথা বলেছিলেন। শোনেননি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এবং নরেন্দ্র মোদি। উলটে তাঁদের দল সেদিন তাঁদের গাল পেড়েছিলেন। বলেছিলেন : সংকট যতই আসুক ঘুরে দাঁড়াতে সরকার ঋণ দিতে পারে, তার বেশি নয়। ঘুরে দাঁড়াতে হবে নাগরিককে নিজেকে । তাকে নাকি স্বনির্ভর হতে হবে।খুব ভালো কথা। কিন্তু এই স্বনির্ভর হবার পথে রাষ্ট্র কিন্তু তার পাশে নেই। বরং রাজ্যকে আরো বেশি কর দিয়ে বাঁচতে হবে। তাদের কথা একটাই : বেশি ঋণ নিয়ে বেশি মুনাফা করার রাস্তা খুঁজে নাও। নইলে নিপাত যাও। সংকটজনক অর্থনীতিতে সরকারের এই হারাকিরি নীতি দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত করে অর্থনীতিকে যে আরো বিপদে ফেলবে সেটা বোঝার ক্ষমতা তাদের ছিল না । এইভাবে দাঁড়াবার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যে যায় না এই সরকারকে সেটা বোঝানোর সাধ্য সম্ভবত, পুরনো বাংলার প্রবাদ অনুযায়ী দেখলে , শিবের পিতৃপুরুষেরও নেই। ফলে , তার চেষ্টা করাও বাতুলতা। অর্থনীতি সম্পর্কে যাঁদের বিন্দুমাত্র ধারনা আছে তাঁরা জানেন এই সময় দরকার রাষ্ট্রের উদ্যোগে বেশি বেশি বিনিয়োগ। তাতে কর্মসংস্থান হবে আরও বেশি , ফলে বাজারে আসবে নতুন টাকা , তাতে জিনিসের দাম কম থাকবে, বা বাড়লেও তা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, সবথেকে বড়ো কথা, মানুষের হাতে টাকা থাকবে । সেই উদ্বৃত্ত অর্থই বাজারের প্রাণ হবে, যা নতুন লগ্নি এবং নতুন কর্মসংস্থানকে আরো বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করবে। এই নীতিতে না এগোনোর জন্যই আজ নিজের কোষাগার সামাল দিতে ব্যর্থ সরকার ,যা সামাল দিতে লাগাতার দাম বৃদ্ধি হচ্ছে। নিট ফল, অর্থনীতি ডুবছে, জেরবার দেশের মানুষ।

লেখা ৯

বাংলায় শিল্প উদ্যোগ : একটি জরুরি আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দোসরা বৈশাখ, বাংলা নতুন বছরের দ্বিতীয় দিনে বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের আয়োজনে নিউ টাউনের বেঙ্গল বিজনেস ক্লাবে হয়ে গেল ‘ ভাবনায় এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও বাংলায় ব্যবসায়িক উদ্যোগ আজ কেন স্তব্ধতার মুখে’ শীর্ষক এক বর্ণাঢ্য আলোচনাসভা।এদিন আলোচনায় যোগ দেন জর্জ টেলিগ্রাফের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুব্রত দত্ত, ইউনিরক্স বাইক্স –এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুবীর ঘোষ, পিয়ারলেস হোটেলস লি.-র এড ইলেক্ট দেবশ্রী রায় সরকার , ওভারসীজ গ্রুপের সিইও আশিস পণ্ডিত এবং শিল্পী শুভাপ্রসন্ন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন বিয়ন্ড রেড ওসিয়ান কন্সাল্টিং-এর এম ডি, বিজনেস কোচ ও ফাউন্ডার মলয় চক্রবর্তী। আলোচকদের কথায় কথায় এদিন উঠে আসে বাংলার ব্যবসায়িক প্রচেষ্টাগুলির সামনের চ্যালেঞ্জগুলির পাশাপাশি এইসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে করণীয়, এবং এই বিষয়ে সফল ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির তরফে নবাগতদের উদ্দেশ্যে নানা পরামর্শ এবং সেই সূত্রে তাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মূল্যবান অভিজ্ঞতার সারাৎসার। নতুন বাংলা বছরের প্রথম দিনে ছোট কিন্তু মনোজ্ঞ এই আলোচনা সভায় যেমন একদিকে উদ্ভাসিত হয় স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং তার পিছনের উদ্যোগের জরুরি ছবিটা, তেমনি বেরিয়ে আসে এইসব সংস্থার সাফল্যের পিছনে রয়ে যাওয়া দৃষ্টিকোণের প্রসঙ্গটিও।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন